Vol. 50 | No. 2-3 | 2013

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বাংলা পরোক্ষ কথনকৃতি বিশ্লেষণ

Volume	50
Issue	2-3
Year	2013
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Syed Shahrier Rahman
Published online	June 1, 2013
DOI	10.62328/sp.v50i2-3.3
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v50i2-3.3
Pages	৫৯-৬৮
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

বাংলা পরোক্ষ কথনকৃতি বিশ্লেষণ

Check for updates

সৈয়দ শাহরিয়ার রহমান*

প্রায়োগিক বিবেচনায় ভাষার অবিচ্ছেদ্য অংশ কথনকৃতি (speech act)। অভিন্ন ভাষা ব্যবহার করেন এমন একদল মানুষের সংজ্ঞাপন পরিসীমায় একজন বক্তা যা বলেন এবং এক বা একাধিক শ্রোতা যা শোনেন, সেই বক্তব্য বোধগম্য হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে কথনকৃতির রয়েছে বিশেষ ভূমিকা। মানব সংজ্ঞাপনে কথনকৃতির এই অপরিহার্য প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনা করে প্রয়োগবিজ্ঞানে (pragmatics) সুপ্রতিষ্ঠা লাভ করেছে কথনকৃতি তত্ত্ব। এই তত্ত্বের অন্যতম প্রান্ত হলো পরোক্ষ কথনকৃতি; যেখানে বক্তা এবং শ্রোতা পরস্পরের প্রতি এক ধরনের বোঝাপড়ার ভিত্তিতে আপাত-প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশিত বক্তব্যের বাইরে গিয়ে আরও বেশি কিছু সংজ্ঞাপিত করতে সমর্থ হন। সারলে (Searle, 1975) বিষয়টিকে যেভাবে দেখেছেন তার আলোকে বলা যায় যে, এ ক্ষেত্রে বক্তার কথনকৃতি সরাসরি সবকিছু বয়ান না করে পরোক্ষ কোনো কৌশল গ্রহণ করে যার মধ্য দিয়ে শ্রোতার কাছে সংজ্ঞাপিত হয় বক্তার অনির্বচনীয় অথচ অন্বিষ্ট বিবিধ তথ্যানুষঙ্গ। উদাহরণস্বরূপ অনুজ্ঞাবাচকতার প্রকাশে পরোক্ষ কথনকৃতির প্রয়োগকে বিবেচনা করা যেতে পারে । কোনো প্রশ্নবাক্য কিংবা বিবৃতি ব্যবহার করে যদি প্রকারান্তরে অনুজ্ঞাবাচকতার প্রকাশ ঘটানো হয় তাহলে বক্তার পরোক্ষ কথনকৃতি তাৎপর্যপূর্ণ অভিদ্যোতনা লাভ করে। বাংলা ভাষার আলোকে পরোক্ষ কথনকৃতির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করে এদের প্রয়োগবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য।

কথনকৃতি

তত্ত্ব হিসেবে কথনকৃতির ধারণা বেশ পুরনো। বিভিন্ন ভাষার উপাত্ত বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে এই বিষয় নিয়ে বিগত কয়েক দশক ধরেই বিশ্বব্যাপী নানাবিধ গবেষণা হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। বিশেষ করে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত কথনকৃতির নানা বিচিত্র প্রান্তকে শনাক্ত করবার কাজ এখনও চলমান। এই ধারাবাহিক প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে বর্তমান আলোচনায় কথনকৃতি-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য গবেষণার সহায়তা গ্রহণের মধ্য দিয়ে বাংলা পরোক্ষ কথনকৃতির বিশেষত্ব নিরূপণকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয়েছে। মূল আলোচনায় প্রবেশের পূর্বে, আমাদের প্রথমেই জেনে নেওয়া প্রয়োজন, কথনকৃতি বলতে কী বোঝায়? কথনকৃতি ব্যাখ্যা করার প্রতি ভাষাবিজ্ঞানীরা যেমন আগ্রহ দেখিয়েছেন তেমনি আগ্রহ দেখিয়েছেন প্রয়োগবিজ্ঞানীরা এবং বিশেষ করে দার্শনিকেরা। যদিও বর্তমানে কথনকৃতি অধ্যয়নকে আন্তঃসাংস্কৃতিক প্রয়োগবিজ্ঞানের (cross-cultural pragmatics) একটি শাখা হিসেবে বিবেচনা করা হয়, তবে প্রকৃতপক্ষে এর মূল যোগসূত্রটি ভাষা-দর্শনের (philosophy of language) সঙ্গে সংস্থাপিত। কথনকৃতি তত্ত্বের সঙ্গে নিবিড়ভাবে

* সহযোগী অধ্যাপক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

জড়িয়ে আছে দার্শনিক জে. এল. অস্টিনের নাম। এরই সঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য গ্রিস (Grice, 1957) এবং সারলের (Searle; 1965, 1969,1975) নাম; যাঁরা ভাষিক সংজ্ঞাপনের অপরিহার্য অংশ এই কথনকৃতি তত্ত্বের বিভিন্ন গবেষণা ও বিশ্লেষণে পথিকৃৎতুল্য ভূমিকা রেখেছেন। কথনকৃতি সম্পর্কে *হাউ টু ডু থিংস উইথ ওয়ার্ডস* গ্রন্থে প্রকাশিত অস্টিনের বক্তব্যের সারকথা হলো : একটি নির্দিষ্ট প্রতিবেশে বক্তা যা কিছু উচ্চারণ (utterance) করে তার সঙ্গে একযোগে সে (বক্তা) প্রাসঙ্গিক ভাষিক কৃতি পরিবেশন (perform) করে। আর এই পরিবেশনা উপস্থাপিত হয় বিবৃতি, জিজ্ঞাসা, নির্দেশনা, ক্ষমা প্রার্থনা, ধন্যবাদজ্ঞাপন– এমন আরও বহুরকম প্রক্রিয়ার সাযুজ্যে গড়ে ওঠা অধিভাষিক (metalinguistic) সীমায়। বস্তুত, অধিভাষা ভিত্তিক প্রতিবেশ-নির্ভর (context bound) এই কৃতি-কাঠামো (act-form)-র বিশ্লেষণকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে কথনকৃতি তত্ত্ব। প্রসঙ্গত মনে রাখা প্রয়োজন যে, ধ্বনি, রূপ, বাক্য ও বাগর্থ একটি ভাষার মূল স্তম্ভ বলে বিবেচিত হলেও ভাষা ব্যবহারের সময় এ সকল উপাদানকে পৃথক তথা বিচ্ছিন্নভাবে প্রয়োগ না করে ভাষীরা কথনকৃতি পরিবেশনার মধ্য দিয়েই একে অন্যের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখে। আর এই কারণে তাত্ত্বিকদের অনেকেই কথনকৃতিকে মানবিক সংজ্ঞাপনের ব্যবহারিক একক হিসেবে বিবেচনা করতে চেয়েছেন (Blum-Kulka, House, & Kasper; 1989)। তবে, এই একক কোনো ধ্বনিপ্রতীক, শব্দ অথবা বাক্য থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো উপাদান নয়; বরং এসবের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা সংজ্ঞাপন-সক্ষম ক্ষুদ্রতম ভাষিক অংশ। বর্তমান প্রবন্ধে এই তত্ত্বের বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ সংগত কারণেই সীমিত। তবে প্রতিপাদ্য প্রমাণের প্রয়োজনে কথনকৃতি তত্ত্বের বিশেষ কিছু দিক নিয়ে আমাদের আলোচনার প্রয়োজন হবে। কথনকৃতি তত্ত্বের মূল বিষয়টিকে বুঝতে আরেকটু সহজ হবে সাঈদের (Saeed, 2009) বিশ্লেষণ অনুসরণ করলে; যেখানে তিনি এমিল দুর্খাইম (Durkheim, 1895), ফার্দিনান্দ দ্য সস্যুর (Saussure, 1916)-সহ বিভিন্ন তাত্ত্বিকের চিন্তা-সার বিবেচনায় রেখে দেখিয়েছেন যে, কথনকৃতি হলো এক ধরনের সামাজিক ক্রিয়া; আর তাতে ব্যাখ্যা করা হয়, কীভাবে একজন ভাষা ব্যবহারকারীর অন্বিষ্ট বচন উপস্থাপিত হয় এবং কীভাবে তা শ্রোতার কাছে অনুধাবনীয় হয়ে ওঠে। অস্টিনের (Austin, 1962:91) প্রস্তাব অনুসারে, কথনকৃতিতে তিনটি ধরন বিদ্যমান : প্রথমটি হলো ভাষিক উচ্চারণ, যাকে অভিহিত করা যেতে পারে বয়ানকৃতি (locutionary act) হিসেবে; দ্বিতীয়টি হলো ভাষিক উচ্চারণের পিছনে সামাজিক সীমায় বক্তার যে অভিপ্রায় নিহিত থাকে তা কৌশলে তুলে ধরা– একে শনাক্ত করা যায় অনুবয়ানকৃতি (illocutionary act) অভিধায়; আর তৃতীয়টি হলো উচ্চারিত ভাষিক উপাদানের প্রকৃত প্রতিক্রিয়া, যাকে প্রতিবয়ানকৃতি (perlocutionary act) পরিভাষার সাহায্যে নির্দেশ করা যেতে পারে। বলা প্রয়োজন যে, কথনকৃতির এই ধরনগুলো স্বাধীন অথচ পরস্পর-অন্বিত। তাছাড়া এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই যে, একটি অনুবয়ানকৃতি ভাষা ব্যবহারকারী তথা বক্তার প্রত্যাশা অনুসারেই সংজ্ঞাপিত হবে। অর্থাৎ, কোনো বক্তার অভিপ্রায় যদি হয় শ্রোতাকে কোনো কিছু আদেশ করার লক্ষ্যে ভাষার প্রয়োগ ঘটানো, সেই ক্ষেত্রে এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই যে, শ্রোতা সেই প্রযুক্ত ভাষিক এককে

আদেশ হিসেবেই বিবেচনা করবে এবং সেই আদেশ পালনে সচেষ্ট হবে। বিষয়টি বিশ্লেষণের দাবি রাখে। সাধারণভাবে ভাষা যখন ব্যবহৃত হয়, তখন কথনকৃতির সাহায্যে ভাষা ব্যবহারকারীরা বিবৃতি দেয়, আদেশ করে, প্রশ্ন করে, প্রতিশ্রুতি দেয়– আরও নানাবিধ সংজ্ঞাপন কৌশল তারা অবলম্বন করে থাকে। বলা যেতে পারে, এরূপ সকল ভাষিক যোগাযোগই আসলে ভাষিক ক্রিয়া আর এই ভাষিক ক্রিয়ার একক হিসেবে গ্রহণ করা চলে কথনকৃতিকে। নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে যে, কথনকৃতিতে মুখ্যত ব্যবহৃত হয় বিবৃতি, প্রশ্ন এবং অনুজ্ঞা। কথনকৃতির এই কৌশলগুলো ভাষিক উচ্চারণকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং প্রাথমিকভাবে অনুবয়ানকৃতিকে নির্দেশ করে। এই নির্দেশনা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ হতে পারে। প্রত্যক্ষভাবে একটি বিবৃতিমূলক বাক্য বিবৃতিই বোঝায়; যেমন করে প্রশ্নবাক্য ব্যবহার করে প্রশ্ন করা হয় আর অনুজ্ঞাবাক্য ব্যবহার করে আদেশ, নিষেধ, উপদেশ, প্রত্যাশা প্রভৃতি প্রকাশ করা হয়। বস্তুত এই এক-এক প্রতিসম সম্পর্ক সার্থকভাবে প্রযুক্ত হতে পারে উল্লিখিত অনুবয়ানকৃতির ওপর নির্ভর করেই। আমরা ইতোমধ্যে জেনেছি যে, ভাষিক উচ্চারণের অন্তরালে রয়েছে বক্তার অভিপ্রায়। আর এই অভিপ্রায় যদি হয় বিবৃতি দেওয়া, তবে একটি বিবৃতিমূলক বাক্য বিবৃতিই প্রকাশ করবে, ঠিক যেমনটি ঘটবে প্রশ্নবাক্য কিংবা অনুজ্ঞাবাক্যের ক্ষেত্রেও। অর্থাৎ প্রত্যক্ষ কথনকৃতিতে বক্তার অনুবয়ান-শক্তি (illocutionary force) তথা তার অন্তর্নিহিত অভীষ্ট, সংশ্লিষ্ট বক্তব্য ও অভিপ্রায়ের মধ্যে এক ধরনের সাযুজ্য তৈরি করে। অ্যালানের (Allan, 1986) দৃষ্টিতে বাক্যের ধরন এবং অনুবয়ান-শক্তির মধ্যে রয়েছে এক প্রকার বিশেষ ধরনের সহসম্পর্ক; যেখানে অনুবয়ান-শক্তির প্রাবল্যের তারতম্যের কারণে বক্তা যে ধরনের বাক্য ব্যবহার করে আর যা প্রকাশ করে– তাদের মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য দেখা দেয়। বিশেষ করে পরোক্ষ কথনকৃতির ক্ষেত্রে এই অভিপ্রায় এবং এর প্রকাশিত ফল– এ দুয়ের মধ্যে ব্যবধান বেশি লক্ষ করা যায়। কেননা, পরোক্ষ কথনকৃতিতে বক্তা শ্রোতাকে অনুধাবনের ক্ষেত্রে অনেক বেশি স্বাধীনতা প্রদান করে থাকে। কথনকৃতির পরোক্ষ কাঠামোর কারণে বক্তার অনুবয়ান-শক্তি তার অভিপ্রায়কে পরিবর্তন করে দেয়, যা তার সংজ্ঞাপন প্রক্রিয়াকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে।

পরোক্ষ কথনকৃতি

এটি মূলত প্রত্যক্ষ কথনকৃতির ভিন্নতর প্রকাশ, যেখানে সামাজিক সীমায় প্রচলিত অর্থ কিংবা প্রত্যক্ষ কথনকৃতিকে পাল্টে নিয়ে বক্তা ও শ্রোতার মধ্যকার সরাসরি সম্পর্ককে আড়াল করে রাখা হয়। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, একটি প্রশ্নমূলক বাক্য ব্যবহার করে প্রশ্ন করা হয়, কিংবা একটি বিবৃতিমূলক বাক্যের সাহায্যে তথ্য উপস্থাপন করা হয়। কিন্তু এই প্রচল পন্থাটি যদি পাল্টে যায়; অর্থাৎ, একটি প্রশ্নমূলক বাক্য ব্যবহার করে যদি অনুরোধ করা হয়, কিংবা একটি বিবৃতিমূলক বাক্যের সাহায্যে আদেশ বোঝানো হয় তবে পরোক্ষ কথনকৃতির একটি বিশেষ রূপ প্রকাশিত হয়। বিষয়টি অনুধাবনের জন্য নিচের উদাহরণদুটি লক্ষণীয় :

১.	তুমি কি আমাকে বইটি দুদিনের জন্য ধার দিতে পার?	প্রশ্নের সাহায্যে অনুরোধ
২.	[প্রেক্ষাপট : আমি কোনো কথা শুনতে চাই না।] তুমি আগামীকাল আমার বইটি ফেরত দিচ্ছ।	বিবৃতির সাহায্যে আদেশ

প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ কথনকৃতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সারলে (Searle, 1975) চিহ্নিত করেছেন যে, প্রত্যক্ষ কথনকৃতি মুখ্যত বাচ্যার্থ (denotation) প্রকাশ করে, যেখানে পরোক্ষ কথনকৃতি বাচ্যার্থের অন্তস্তলে প্রোথিত গূঢ়ার্থ (connotation) প্রকাশের জন্যই নিয়োজিত ও ব্যবহৃত হয়। তাই, প্রত্যক্ষ বিবৃতির মধ্য দিয়ে যদি পরোক্ষ আদেশবাচকতা প্রকাশ পায়; তবে একইসঙ্গে বাচ্যার্থ ও গূঢ়ার্থ প্রকাশক একটি পরিস্থিতির অবতারণা হয়ে থাকে। নিচের উদাহরণটি দ্রষ্টব্য :

৩.	তুমি ঘর পরিষ্কার করবে।	বাচ্যার্থ (বিবৃতি) কিন্তু গূঢ়ার্থ (আদেশ)
৪.	ঘর পরিষ্কার করো।	বাচ্যার্থ (আদেশ)

বিষয়টিকে আরও স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। উদাহরণ-৩ এবং উদাহরণ-৪ লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, প্রথমটি শ্রোতার উদ্দেশে বক্তার প্রকাশিত কথনরূপ; অর্থাৎ, বক্তা যেভাবে যে ভাষায় শ্রোতাকে বলেছে তা-ই প্রকাশিত হয়েছে এই উদাহরণে। কিন্তু, উদাহরণ-৪ আমাদের সামনে বক্তা প্রকৃতপক্ষে শ্রোতাকে যা বলতে চেয়েছে তা তুলে ধরছে। অর্থাৎ, বক্তার লক্ষ্য আদেশ করা; কিন্তু উদাহরণ-৩ এ পরোক্ষ কথনকৃতির আশ্রয়ে আপাত বিবৃতিমূলকতার মধ্য দিয়ে বক্তা সংজ্ঞাপন ক্রিয়াটি সম্পাদন করেছে। এখন প্রশ্ন হলো, এরূপ ঘুরিয়ে কথা বলার প্রয়োজন কী? এদের উত্তর সন্ধান করতে গেলে প্রতিভাত হবে যে, এ ধরনের সংজ্ঞাপনক্রিয়ার পেছনে বক্তা ও শ্রোতার সামাজিক সম্পর্কের প্রেক্ষাপটটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সমাজে শ্রোতা যদি বক্তার তুলনায় উচ্চতর ও অধিকতর সম্মানজনক পরিস্থিতিতে অবস্থান করে, তবে বক্তা পরোক্ষ কথনকৃতি ব্যবহারের মধ্য দিয়ে তার অভিপ্রায় ব্যক্ত করে থাকে। এরভিন-ট্রিপ ([illegible]-Tripp; 1976) মনে করেন, পরোক্ষ কথনকৃতি (যেমন : প্রশ্নের সাহায্যে অনুরো[illegible]) অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে দেখা দিতে পারে, যদি শ্রোতার সামাজিক অবস্থানের কারণেই বক্তার পক্ষে শ্রোতাকে আদেশ করবার কোনো সুযোগ না থাকে। আবার, সামাজিকভাবে একস্তরভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও বক্তা এবং শ্রোতা যদি স্বল্প পরিচিত হন কিংবা উভয়ের মধ্যে কোনো কারণে সখ্য না থাকে তবে তারা পরোক্ষ কথনকৃতির আশ্রয় গ্রহণ করেই একে অপরের সঙ্গে সংজ্ঞাপন ক্রিয়া অব্যাহত রাখবে। একইসঙ্গে, এসব ক্ষেত্রে একটি আনুষ্ঠানিক কাঠামোও সমভাবে প্রভাব বিস্তার করে। বক্তা ও শ্রোতা ওই আনুষ্ঠানিক কাঠামো ভেদ করার কোনো সামাজিক স্বীকৃতি লাভ করে না। এর উল্টোপিঠে, খুবই অন্তরঙ্গ পরিবেশে যদি পরোক্ষ কথনকৃতি ব্যবহারের মধ্য দিয়ে অতিরিক্ত মাত্রায় আনুষ্ঠানিকতা প্রদর্শন করা হয় তবে তা-ও বক্তা ও শ্রোতার সামাজিক মিথস্ক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে। তাই বলে এই নয় যে, বক্তা ও শ্রোতার আন্তরিক সংজ্ঞাপনে পরোক্ষ কথনকৃতির কোনো স্থান নেই। কেননা, অন্তরঙ্গতার কারণে আদেশবাচকতাও বিবৃতি কিংবা প্রশ্নের মোড়কে অনুরোধ হিসেবে কথনকৃতিতে স্থান পেয়ে থাকে। এ কারণে পরোক্ষ কথনকৃতির বিবেচনায় প্রধানত তিনটি বিষয় আলোচনা আবশ্যিক হয়ে ওঠে। এই তিনটি দিক হলো : বিবৃতিবাচকতা, প্রশ্নবাচকতা এবং

আদেশবাচকতা। আলোচনার এ পর্যায়ে উল্লিখিত তিনটি দিক নিয়ে আলোকপাত করা প্রয়োজন।

পরোক্ষ কথনকৃতিতে বিবৃতিবাচকতা

সাধারণভাবে বিবৃতি হলো বক্তার আনুষ্ঠানিক ও রীতিসিদ্ধ উচ্চারণ। লিচের মতে (Leech, 1983), বিবৃতিমূলক বাক্যের কাজ হলো এক বা একাধিক বিমূর্ত ধারণাকে কথনকৃতির সাহায্যে মূর্ত করে তোলা। আর এ কাজটি করতে গিয়ে একটি বিবৃতিমূলক বাক্যে স্থান পায় নির্দেশনা, স্বীকৃতি জ্ঞাপন কিংবা প্রতিশ্রুতি প্রদান বিষয়ক বক্তব্য। প্রসঙ্গত, নিচের উদাহরণগুলো বিবেচনা করা যেতে পারে :

ক. নির্দেশনা	
৫. আমি তোমাকে বইটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম	প্রশ্ন
৬. আমি তোমাকে উপহারটি পৌঁছে দিতে বললাম।	অনুরোধ
৭. আমি তোমাকে চোখ নামিয়ে কথা বলতে বলেছি।	বাধ্যবাধকতা
৮. আমি ওখানে যেতে তোমাকে নিষেধ করেছি।	নিষেধাজ্ঞা
৯. আমি তোমাকে প্রস্তাবে রাজি হতে পরামর্শ দিয়েছি।	পরামর্শ
১০. আমি তোমার কক্ষটি ব্যবহারের অনুমতি চাইছি।	অনুমতি
খ. স্বীকৃতি জ্ঞাপন	
১১. এরূপ আচরণের জন্য আমি খুবই লজ্জিত।	স্বীকার করা
গ. প্রতিশ্রুতি প্রদান	
১২. আমি কথা দিচ্ছি এমন কাজ আর হবে না।	প্রতিশ্রুতি
১৩. চাইলেই আমার সহায়তা পাওয়া সম্ভব।	প্রস্তাব
ঘ. অনুমান	
১৪. আমার ধারণা সে এই বিপদ থেকে ঠিক উদ্ধার পাবে।	অনুমিত ধারণার প্রকাশ
ঙ. দাবি করা	
১৫. আমি বলছি তুমি সেদিন পার্কে বসেছিলে।	দাবি প্রতিষ্ঠা
চ. ঘোষণা করা	
১৬. আজ থেকে কুকুরটির নাম রাখা হলো বাঘা।	কার্যকর হওয়া
১৭. বিচারকের রায়ে লোকটি দোষী সাব্যস্ত হলো।	সিদ্ধান্ত প্রদান

ওপরের বাক্যগুলো বিশ্লেষণের দাবি রাখে। লক্ষণীয়, ওপরের সবগুলো বাক্যই সাধারণভাবে বিবৃতি প্রকাশ করছে। কিন্তু সূক্ষ্মভাবে বিবেচনা করলে দেখা যাবে যে, এদের প্রতিটিই কোনো না কোনোভাবে প্রশ্নবাচকতা কিংবা অনুজ্ঞাবাচকতা প্রকাশ করছে। আর এই প্রশ্ন ও অনুজ্ঞা প্রকাশের কাজটি সম্পন্ন করতে আশ্রয় নেওয়া হয়েছে পরোক্ষ কথনকৃতির। উদাহরণ-৫ এর বাক্যটি মূলত 'তুমি বইটি সম্পর্কে কী জান' এই প্রত্যক্ষ প্রশ্নবাচক বাক্যটির পরোক্ষরূপ। এভাবে উদাহরণ-৬ থেকে উদাহরণ-১০ পর্যন্ত বাক্যসমূহের প্রত্যক্ষ কথনকৃতিতে ব্যবহৃত রূপগুলো হলো যথাক্রমে : 'তুমি উপহারটি পৌঁছে দিও', 'চোখ নামিয়ে কথা বল', 'ওখানে যেও না', 'প্রস্তাবে রাজি হয়ে যাও', 'কক্ষটি ব্যবহার করতে চাই'। এই প্রতিটি উদাহরণে ব্যবহৃত বাক্যে এক ধরনের নির্দেশনা রয়েছে। কিন্তু এই নির্দেশনা সরাসরি নয়, বরং বিবৃতির আশ্রয়ে অনুবয়ান-শক্তির প্রাবল্য

কমিয়ে নিয়ে এসে পরোক্ষ কথনকৃতির সাহায্যে এই কাজটি করা হয়েছে। বিবৃতির বৈচিত্র্যপূর্ণ ব্যবহার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে উদাহরণ-১১ থেকে উদাহরণ-১৭ পর্যন্ত। এসব উদাহরণেও বিবৃতিকে পরোক্ষ কথনকৃতির উপকরণ হিসেবেই ব্যবহার করা হয়েছে।

বিবৃতিমূলক বাক্যে প্রকাশ পায় বক্তার উপলব্ধি, জীবন-অভিজ্ঞতা সঞ্জাত অভিব্যক্তি এবং সুনির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে ওই বক্তার বিশ্বাস। পরোক্ষ কথনকৃতি নির্ধারণ করে দেয় বক্তা নিজের এই বিশ্বাস ও উপলব্ধিকে কীভাবে সরাসরি না বলে সুনির্দিষ্ট অথচ ভিন্ন কোনো পন্থা অবলম্বন করে প্রকাশ করতে পারে। বিবৃতি সাধারণত ব্যক্ত হয় একটি সামাজিক দলের অবস্থানসীমায় এবং সংশ্লিষ্ট সামাজিক দলটির অনুমোদন সাপেক্ষেই বক্তার বক্তব্য প্রতিষ্ঠা লাভ করে। আর তাই বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিবৃতিতে যখন পরোক্ষ কথনকৃতি ব্যবহৃত হয় তখন তা কতটুকু কার্যকরভাবে সমাজে প্রতিষ্ঠা পাবে তা মূলত নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট কথনকৃতির অনুবয়ান-শক্তির ওপর (Cruse, 2000)। কেননা, একটি বিবৃতিমূলক বাক্যের পেছনে বক্তার অভিপ্রায় কী ছিল তার বহুমাত্রিকতা মূলত ওই বাক্যের অন্তর্নিহিত অনুবয়ান-শক্তি কতটা বেশি তার ওপর নির্ভরশীল। উদাহরণস্বরূপ বলা চলে যে, 'সে দৌড়ে আসছে' বাক্যটি আতঙ্ক, উৎকণ্ঠা, আগ্রহ প্রভৃতি বিভিন্ন আবেগ প্রকাশে সমর্থ। লক্ষণীয়, কোন প্রেক্ষাপটে কোন সামাজিক সীমায় কোন তাৎপর্য মুখ্য হয়ে উঠবে তার ওপর নির্ভর করেই সংশ্লিষ্ট কথনকৃতি সংজ্ঞাপিত হয়।

পরোক্ষ কথনকৃতিতে প্রশ্নবাচকতা

প্রশ্নবাক্য যখন পরোক্ষ কথনকৃতিতে ব্যবহৃত হয় তখন তা একাধারে অনুরোধ, পরামর্শ, সাবধানবাণী-সহ বিবিধ মাত্রায় সংজ্ঞাপিত হবার সামর্থ্য প্রদর্শন করে থাকে। ইতোমধ্যেই উদাহরণ-১ এ আমরা দেখেছি যে, কীভাবে প্রশ্নের সাহায্যে পরোক্ষ কথনকৃতিতে অনুরোধ প্রকাশ পেতে পারে। এ পর্যায়ে এসে আমরা বিষয়টিকে আরও বেশি নিবিড়ভাবে অবলোকনে সচেষ্ট হব। অ্যালান (Allan, 1986) প্রশ্নবাচকতাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দেখিয়েছেন যে, পরোক্ষ কথনকৃতিতে ব্যবহৃত প্রশ্নবাক্যের সাহায্যে শ্রোতাকে কোনো একটি সুনির্দিষ্ট ক্রিয়া সম্পাদনের জন্য আহ্বান করা হয়। এই আহ্বানের অন্তরালে নির্দেশনা থাকতে পারে, থাকতে পারে অনুরোধ। বক্তা ও শ্রোতার এই সম্মিলিত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় যে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তা হলো প্রশ্নবাক্য যখন কেবল প্রত্যক্ষভাবে প্রশ্ন হিসেবেই কথনকৃতিতে ব্যবহৃত হয়, তখন তাতে অনিবার্যভাবে শ্রোতার কাছ থেকে বাচনিক (verbal) প্রতিবয়ানকৃতির প্রয়োজন দেখা দেয়; অথচ পরোক্ষ কথনকৃতিতে ব্যবহৃত প্রশ্নবাক্য যখন অনুরোধ কিংবা নমনীয় ভঙ্গিতে কোনো নির্দেশনা প্রদানে ব্যবহৃত হয় তখন অ-বাচিক (non-verbal) প্রতিবয়ানকৃতিও সমভাবে সক্রিয় হতে পারে। নিচে তুলনামূলক উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি দেখানো যেতে পারে :

১৮. তুমি কোথায় যাও?	প্রত্যক্ষ প্রশ্নবাচকতা
১৯. তুমি কি প্রশ্নটির উত্তর জানো?	প্রত্যক্ষ প্রশ্নবাচকতা
২০. আমি কি এক গ্লাস পানি পেতে পারি?	পরোক্ষ অনুরোধ
২১. কলমটা একটু এগিয়ে দেবে?	পরোক্ষ অনুরোধ

লক্ষণীয় যে, সবধরনের প্রশ্নবাক্যেই কোনো না কোনোভাবে এক বা একাধিক অজানা অংশ থাকে (Cruse, 2000)। এটি প্রত্যক্ষভাবে কোনো প্রশ্ন করা হলে তাতে যেমন পাওয়া যায়, তেমনি পরোক্ষ কথনকৃতিতে ব্যবহৃত প্রশ্নবাক্যের সাহায্যে অনুরোধ কিংবা নির্দেশনার কোনো ঘটনা ঘটলেও তাতে ওই অজানা অংশের উপস্থিতি অনিবার্য। ওপরের উদাহরণগুলোর আলোকে বিষয়টিকে দেখা যেতে পারে। উদাহরণ-১৮ এবং উদাহরণ-১৯ এ প্রত্যক্ষভাবে প্রশ্ন করা হয়েছে এবং উভয় ক্ষেত্রেই না-জানা অংশ বিদ্যমান। বস্তুত, ওই অজানা অংশের উত্তর খুঁজতেই তো বক্তা প্রশ্ন করেছে শ্রোতাকে। একইভাবে, উদাহরণ-২০ এবং উদাহরণ-২১ এ প্রশ্নের সাহায্যে অনুরোধ করা হলেও বক্তার জানা নেই শ্রোতা তার সেই অনুরোধ রক্ষা করবে কি না! আর তাই এক্ষেত্রেও অজানা অংশ রয়েই যাচ্ছে। এই অজানা অংশের উত্তর পাওয়া যাবে কি না তা আবার নির্ভর করে বক্তার বক্তব্যে অনুবয়ান-শক্তি কতটা আছে তার ওপর। বিশেষ করে, প্রশ্নের সাহায্যে যখন পরোক্ষ কথনকৃতির সীমায় কোনো অনুরোধ কিংবা নির্দেশনা প্রদান করা হয় তখন ওই অনুবয়ান-শক্তিই নির্ধারণ করে দেয় শ্রোতা আদৌ কতটা প্রতিবয়ানকৃতি প্রদর্শন করবে।

পরোক্ষ কথনকৃতিতে আদেশবাচকতা

ভাষা ব্যবহারে আদেশবাচকতার মুখ্য দিক হলো, সংশ্লিষ্ট ক্রিয়াটি কীভাবে সংঘটিত হবে তার জন্য সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা প্রদান করে ক্রিয়াটি পরিচালনার ব্যবস্থা করা। আমরা জানি, আদেশবাচকতার মূল লক্ষ্য বক্তার কোনো একটি ক্রিয়া সম্পাদিত হওয়ার প্রত্যাশাকে ব্যক্ত করা। গিভন (Givon, 2001) বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দেখিয়েছেন যে, অনুজ্ঞা প্রকাশক বাক্যসীমায় অবস্থিত আদেশবাচকতার মূলে আছে ক্রিয়াকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে পরিচালিত করিয়ে নেওয়ার কৌশল। এতে বক্তা সুনির্দিষ্ট কথনকৃতির প্রয়োগ ঘটিয়ে শ্রোতাকে দিয়ে ক্রিয়া সম্পাদন করিয়ে নিতে চায় তথা করিয়ে নেওয়ার প্রত্যাশা ব্যক্ত করে। শ্রোতাকে দিয়ে কাজটি করিয়ে নেওয়ার যে কৌশল আদেশবাচকতায় নিহিত রয়েছে তা মূলত নির্ভর করে এই প্রত্যাশা কতটা শক্তিশালী তার ওপর। আর প্রত্যাশার শক্তি প্রকাশ পায় বক্তার ব্যবহৃত ক্রিয়াশব্দের মধ্য দিয়ে। প্রসঙ্গত নিচের দৃষ্টান্তগুলো লক্ষ করা যেতে পারে :

২২. শিক্ষক ছাত্রকে দোষ স্বীকারে বাধ্য করলেন।
২৩. সে ছেলেটিকে দোষ স্বীকার করতে বলল।

ওপরের দুটি বাক্যই বিবৃতিমূলক এবং পরোক্ষ কথনকৃতির সাহায্যে এতে আদেশবাচকতা প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু লক্ষ করা যায় যে, উদাহরণ-৫ এ বর্ণিত বাক্যটির অর্থ দাঁড়ায়– "ছাত্রটি দোষ স্বীকার করল"। অথচ, উদাহরণ-৬ এ এই ধরনের কোনো ফল ঘটবেই তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। কেননা, ছেলেটিকে দোষ স্বীকার করতে বলা হলেও ছেলেটি আদৌ দোষ স্বীকার করবে কি না তা এই বাক্য থেকে জানা যায় না। অর্থাৎ, পরোক্ষ কথনকৃতিতে আদেশবাচকতা কতটুকু শক্তিশালীভাবে প্রকাশিত হবে তা মূলত নির্ভর করে ব্যবহৃত ক্রিয়াবাচক শব্দের ওপর। এই ক্রিয়াবাচক শব্দগুলোকে বলা যেতে পারে পরিচালনামূলক ক্রিয়া (manipulative verb)। এক্ষেত্রে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বাংলা

ব্যাকরণভুক্ত প্রযোজক ক্রিয়ার সঙ্গে আলোচ্য পরিচালনামূলক ক্রিয়া পুরোপুরি অভিন্ন হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না। কেননা, উভয়ের সংজ্ঞার্থগত সাযুজ্যকে বিবেচনায় রেখেও বলা যায় যে, প্রযোজক ক্রিয়া ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অনুজ্ঞার প্রকাশ সবসময় না-ও থাকতে যারে। যেমন, 'দেখানো', 'পড়ানো' প্রভৃতি ক্রিয়া এবং এদের রূপবৈচিত্র্যের প্রয়োগে অনুজ্ঞাবাচকতা অনুপস্থিত। কিন্তু পরিচালনামূলক ক্রিয়া ব্যবহারে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অনুজ্ঞার উপস্থিতি আবশ্যক। বাংলা ভাষায় এ ধরনের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি পরিচালনামূলক ক্রিয়া হলো : 'বাধ্য করা', 'করানো', 'করতে বলা', 'প্রত্যাশা করা', 'আদেশ করা/দেয়া' প্রভৃতি। ইতোমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আদেশের শক্তি প্রকাশ পায় ব্যবহৃত ক্রিয়াশব্দের সাহায্যে। বক্তার অন্তর্নিহিত অনুবয়ান-শক্তিই মূলত নির্ধারণ করে বক্তার আদেশসামর্থ্য কীরূপ হবে এবং সেই নিরূপিত আদেশসামর্থ্য অনুসারেই ক্রিয়াশব্দ নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে। উল্লিখিত ক্রিয়াশব্দগুলোর মধ্যেও এই তারতম্য লক্ষ করা যেতে পারে। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, 'বাধ্য করা' এবং 'আদেশ করা'– এ দুটি পরিচালনামূলক ক্রিয়াশব্দ সমশক্তিসম্পন্ন আদেশবাচকতা প্রকাশ করে না। তাই 'সে ছেলেটিকে চলে যেতে বাধ্য করল' এবং 'সে ছেলেটিকে চলে যেতে আদেশ করল'– বাক্য দুটি বিবৃতির সাহায্যে উচ্চারিত পরোক্ষ কথনকৃতির উদাহরণ হলেও উভয়ের আদেশসামর্থ্য পৃথক। তবে আদেশসামর্থ্যের এ তুলনা কেবল অভিন্ন সমাজভাষাবৈজ্ঞানিক প্রেক্ষাপটেই নির্ণয় করা সম্ভব। এ প্রসঙ্গে সমাজভাষাবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টিকে বিবেচনা করা যেতে পারে। আমরা জানি, সামাজিক শ্রেণিক্রম বিভিন্ন সময়ে ভাষা এবং এর প্রয়োগকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। সামাজিক স্তরবিন্যাস ভাষার ব্যবহারকে যেমন প্রভাবিত করে, তেমনি কথনকৃতির ওপরও তা সমভাবে প্রভাব বিস্তারে সক্ষম। বস্তুত, একটি সামাজিক কাঠামোর আওতায় বক্তা ও শ্রোতার শ্রেণিসম্পর্ক কী, তার ওপরও পরিচালনামূলক ক্রিয়ার আদেশসামর্থ্য নির্ভরশীল। কেননা, অধিকতর উচ্চশ্রেণিভুক্ত বক্তা যদি অধীনস্থ কোনো শ্রোতার উদ্দেশে উচ্চারিত কথনকৃতিতে 'আদেশ করা' জাতীয় আপাতদৃষ্টিতে কম সমর্থ কোনো পরিচালনামূলক ক্রিয়াশব্দ ব্যবহার করে, তবে তা সামাজিক স্তরবিন্যাসের কারণে অধিক সামর্থ্যসম্পন্ন হয়ে উঠতে পারে। তাই সমাজভাষাবৈজ্ঞানিক বিবেচনায় পরোক্ষ কথনকৃতিতে আদেশবাচকতার তুলনামূলক চিত্র নিচে তুলে ধরা যেতে পারে :

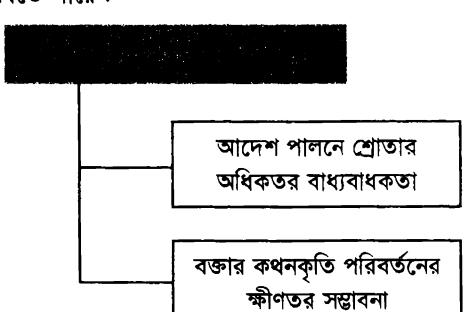

চিত্র: সামাজিকভাবে উচ্চশ্রেণিভুক্ত বক্তার কথনকৃতিতে আদেশবাচকতা

ওপরের রেখচিত্রে দেখা যাচ্ছে যে, বক্তার আদেশসামর্থ্য এবং শ্রোতার আদেশ পালনের বাধ্যবাধকতা মূলত সমানুপাতিক। আদেশসামর্থ্য যত বেশি হবে আদেশ পালনের বাধ্যবাধকতাও তত বৃদ্ধি পাবে। বক্তার উচ্চমাত্রার আদেশসামর্থ্যের সঙ্গে আবার তার কথনকৃতিরও সম্পর্ক বিদ্যমান। কেননা, আদেশসামর্থ্য বৃদ্ধি পেলে স্বাভাবিকভাবেই বক্তা তার কথনকৃতিতে অটল থাকতে পারে। তাকে আর কথনকৃতি পাল্টে নিয়ে আদেশবাচকতায় কোনো পরিবর্তন ঘটাতে হয় না। নিচের রেখাচিত্রটি এর বিপরীত :

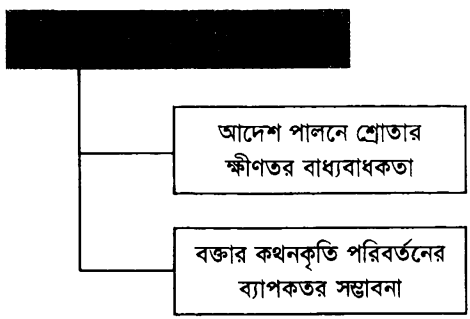

চিত্র : সামাজিকভাবে উচ্চশ্রেণিভুক্ত শ্রোতার কথনকৃতিতে আদেশবাচকতা

এই রেখাচিত্রে সামাজিক প্রতিবেশের কারণে শ্রোতার আদেশসামর্থ্য বেশি। আর তাই পুনরায় গাণিতিক পরিভাষা ব্যবহার করে বলা যায় যে, এই সামর্থ্য শ্রোতার আদেশ পালনের মাত্রার সঙ্গে ব্যস্তানুপাতিক। ফলে, স্বাভাবিক কারণেই বক্তাকে নিজের কথনকৃতিতে প্রযুক্ত আদেশবাচকতার হ্রাস ঘটিয়ে পরোক্ষ ও নমনীয় কথনকৃতি নির্বাচন করতে হবে। এভাবে সামাজিক প্রেক্ষাপট বক্তা ও শ্রোতার কথনকৃতিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে।

শেষকথা

সুতরাং ভাষা ব্যবহারের অনিবার্য অংশরূপে প্রযুক্ত পরোক্ষ কথনকৃতিতে বিবিধ মাত্রার প্রয়োগবৈজ্ঞানিক বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। ওপরের আলোচনায় যে বিষয়টি বারবার প্রকট হয়ে উঠেছে, তা হলো পরোক্ষ কথনকৃতির মধ্যে এক ধরনের অনিশ্চয়তা। কেননা, বিবৃতি দিয়ে যখন বিবৃতি বোঝায় না, প্রশ্ন দিয়ে যখন প্রশ্ন বোঝায় না, তখন স্বাভাবিকভাবেই বুঝে নেওয়ার দায়িত্বটা অনেকাংশে এসে পড়ে শ্রোতার ওপর। কিন্তু তাই বলে বক্তার ভূমিকাকেও এক্ষেত্রে খাটো করে দেখার উপায় নেই। তাই পরোক্ষ কথনকৃতি মূলত বক্তা ও শ্রোতার এক প্রকার সম্মিলিত চুক্তি— যেখানে বক্তার না-বলা কথাও শ্রোতা বুঝে নেয় এবং সেই উপলব্ধি অনুযায়ী কী ধরনের প্রতিবয়ানকৃতি পরিবেশন করবে তার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায় বাঙালি বক্তা ও শ্রোতা এই সম্মিলিত সংজ্ঞাপন প্রক্রিয়াটি কি আবহমানকাল ধরে একইভাবে করে আসছে; না-কি সময় ও সমাজের পরিবর্তনে

এক্ষেত্রেও নানা নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে। এই প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে প্রয়োজন হবে বিস্তৃত ও ব্যাপকতর মাঠ পর্যায়ের গবেষণার। বাংলা ভাষার একটি পূর্ণাঙ্গ কথন অবয়ব যদি গড়ে তোলা সম্ভব হয় তবেই আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব হবে বাঙালিদের কথনকৃতির বিবিধ সূক্ষ্মতর বিশেষত্ব।

গ্রন্থপঞ্জি

Allan, K. (1986). *Linguistic Meaning*, vols 1 and 2, London : Routledge & Kegan.

Austin, J.L. (1962). *How to do things with words: The William James Lectures delivered at Harvard University in 1955*. Ed. J.O. Urmson. London : Oxford University Press.

Blum-Kulka, S., House, J., & Kasper, G. (1989). *Cross-cultural pragmatics : Requests and apologies*. Norwood, N.J.: Ablex.

Cruse, A. (2000). *Meaning in language : An introduction to semantics and pragmatics*. UK : Oxford University Press.

Durkheim, Émile (1895) [1982]. *The rules of sociological method*, Ed. by Steven Lukes, New York: Free Press

Ervin-Tripp, S. M. (1976). Speech acts and social learning. In K. H. Basso & H. Selby (Eds.), *Meaning in anthropology*. University of New Mexico Press

Givón, T. (2001). Toward a neuro-cognitive interpretation of context, *Pragmatics and Cognition, 9,* 2.

Grice, H.P. (1975). Logic and conversation. In A. Jaworski, & N. Coupland (Eds.), *The discourse reader,* New York : Routledge.

Leech, G. (1983). *Principles of Pragmatics*, New York: Longman Singapore Publishing

Saeed, John I. (2003). *Semantics*. 2nd ed. Malaysia : Blackwell Publishing.

Saussure, Ferdinand de (1916) [1977] *Cours de linguistique générale*, ed. C. Bally and A. Sechehaye, with the collaboration of A. Riedlinger, Lausanne and Paris : Payot; trans. W. Baskin, *Course in General Linguistics*, Glasgow : Fontana/ Collins.

Searle, J. (1965). What is a speech act? In P. P. Giglioli (Ed.), *Language and social context,* Harmondsworth, England : Penguin Books.

Searle, J. (1969). *Speech acts : An essay in the philosophy of language.* Cambridge : Cambridge University Press.

Searle, J. (1975). *Indirect speech acts*. In P. Cole and J. Morgan (Eds.), *Syntax and semantics,* vol. 3 : *Speech Acts*, New York.